বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
১০৪ বর্ষ ২৮৯ সংখ্যা শনিবার ১৮ পৌষ ১৪৩২ কলকাতা

প্রতিরোধ

আরাবল্লী পর্বতের পরিবর্তিত সংজ্ঞা আপাতত স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতেরই ২০ নভেম্বর তারিখের রায়কে স্থগিত রেখে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানাল, নতুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে আরাবল্লী বিষয়ে নতুন ভাবে পর্যালোচনার পরই এই পর্বতের সংজ্ঞা স্থির করা যেতে পারে। ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের এই স্বপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করা মামলার গুরুত্ব বিপুল। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত উল্লেখ করেছেন আরাবল্লীর নতুন সংজ্ঞা বিষয়ে গণপরিসরে বিপুল আপত্তির কথা। অর্থাৎ, শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগ কোনও অন্যায় আচরণ করলে সেটাই যে শেষ কথা নয়, গণপরিসরে যথেষ্ট আপত্তি তৈরি হলে শেষ পর্যন্ত তার প্রতিফলন ঘটতে পারে আদালতের সিদ্ধান্তেও— এই কথাটি দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করবে। বিশেষত এই ভয়ঙ্কর সময়ে, যখন সরকারের কর্মকাণ্ডে জনস্বার্থের গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান। বস্তুত, আরাবল্লীর ক্ষেত্রে পাহাড়ের সংজ্ঞাবাচক উচ্চতা যত স্থির করা হবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছিল বলেই অভিযোগ। স্থানীয় ভূমিস্তর থেকে অন্তত একশো মিটার উচ্চতা হলে তবেই তাকে আরাবল্লী পর্বতমালার অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে, এবং দু'টি পাহাড়ের মধ্যে ব্যবধান ৫০০ মিটারের বেশি হলে তা আরাবল্লীর অংশ হিসাবে গণ্য হবে না, এই দু'টি সিদ্ধান্তের ফলে আরাবল্লীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হত, শীর্ষ আদালতের স্থগিতাদেশের ফলে তা অন্তত সাময়িক ভাবে আটকানো গেল। আশা করা যায়, আদালত যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করবে, তা এই প্রশ্নগুলিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে— তার পর গৃহীত হবে সিদ্ধান্ত।

আরাবল্লী পর্বতমালা নিয়ে জন আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। পাহাড়ে বেআইনি খনির বিরুদ্ধে ১৯৯০-এর দশকে আন্দোলন তীব্র হওয়ার ফলে সে অবৈধ কাজকর্ম বন্ধ হয়েছিল। তার এক-দেড় দশক পর থেকে ফের তা শুরু হতে থাকে। এখন পাহাড়ের নীচে থাকা খনিজের প্রতি বাণিজ্যিক লোভ রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাচ্ছে, এবং সেই কারণেই পাহাড়ের সংজ্ঞা পাল্টে দেওয়ার এ-হেন প্রচেষ্টা বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ দেখাল, প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নাগরিক প্রতিরোধই যদি জোরদার হয়, তবে সর্বশক্তিমান সরকারের অভিপ্রায়কেও ঠেকানো সম্ভব। কী ভাবে আরাবল্লী দখলের প্রশাসনিক চেষ্টা হয়েছে, তার আরও একটি উদাহরণ হল 'তিন ডিগ্রি নিয়ম'। এই নিয়ম অনুসারে, কোনও ভূপ্রাকৃতিক গঠনের উন্নতি কোণ যদি অন্তত তিন ডিগ্রি হয়, তবেই তা পাহাড় হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। বর্তমান পরিমাপে 'আরাবল্লী ডিসট্রিক্ট'-গুলির সামগ্রিক গড় উন্নতি কোণ হিসাব করা হয়েছে। যেখানে এই জেলাগুলির অধিকাংশ অঞ্চলই সমতল, সেখানে গড় উন্নতি কোণ কম হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে, ৩৪টির মধ্যে ১২টি জেলার নাম এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। আরাবল্লী দখল করার এই সরকারি অত্যুৎসাহ কেন, সে প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় ভারতবাসীকে নতুন করে জানানোর প্রয়োজন নেই।

আরাবল্লীর ঘটনাক্রম ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি গভীর উদ্বেগের জায়গাকে আরও স্পষ্ট করে দিল। পাহাড় ভেঙে খনি অথবা বহুতল আবাসন গড়ে তুললে কাদের লাভ, তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। কাদের ক্ষতি, সে কথাও একই রকম স্পষ্ট। ক্ষতি বাস্তুতন্ত্রের, এবং ক্ষতি সেই পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রের উপরে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর, যাঁদের একটি বড় অংশ তফসিলি জনজাতিভুক্ত। তার বাইরেও, এই পাহাড় ধ্বংস হলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি বড় অংশে মরুভূমি তৈরি ও প্রসারিত হবে, দূষিততর হবে বাতাস। যাঁর আর্থিক অবস্থা যত খারাপ, সেই বিপদের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা তাঁর ততই কম। এই ঘটনাক্রম দেখাল, এমন পরিস্থিতিতে সরকার কার পক্ষে থাকতে চায়।

সুযোগ

পড়শি রাষ্ট্র মায়ানমারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন। তিন পর্বের প্রথম পর্ব গত ২৮ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হয়েছে। বাকি দুই পর্ব চলবে জানুয়ারি মাস জুড়ে। কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই জালিয়াতির অভিযোগ তুলে সেনাবাহিনী (জুন্টা) জনপ্রিয় নেত্রী আউং সান সু চি-র ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি)-র ২০২০ সালের জয়কে বাতিল করার প্রায় পাঁচ বছর পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অভ্যুত্থানই ব্যাপক বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর সহিংস দমনপীড়ন এবং জাতিগত সংখ্যালঘু মিলিশিয়ার সঙ্গে জোটবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর উত্থানের জন্ম দিয়েছে।

এই পটভূমিতে, শুধুমাত্র জুন্টা নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিতেই এখন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কাগজে-কলমে, ৫৭টি রাজনৈতিক দল এবং ৪,৮০০ জনেরও বেশি প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, বাস্তবে চিত্রটি উল্টো। সেনাবাহিনী-প্রণীত নিয়মের অধীনে মাত্র ছয়টি দলকে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সু চি এখনও সামরিক বন্দিদশায়, তাঁর দলকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এখন বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী হল সামরিক-সমর্থিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি), যারা বহু নির্বাচনী এলাকায় কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হলেও, মায়ানমারের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমন ভাবেই তৈরি যাতে সামরিক আধিপত্য বজায় থাকে। ২০০৮ সালের সংবিধান অনুসারে, সংসদীয় আসনের ২৫ শতাংশ কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য সংরক্ষিত, যা সামরিক বাহিনীকে সাংবিধানিক পরিবর্তনের উপর কার্যকর ভেটো ক্ষমতা প্রদান করে। মায়ানমারের সামরিক শাসকরা নির্বাচন পরিচালনা করছেন তাঁদের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যেই। অধিকাংশ পশ্চিমি রাষ্ট্র গোটা প্রক্রিয়াটিকে প্রহসন বলে মনে করছে। ভারত ও চিন অবশ্য মায়ানমারের নির্বাচনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

ভুললে চলবে না, মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের আঁচ পড়েছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও। এই পরিস্থিতি সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য ভাবে উস্কে দিয়েছে মণিপুরের মেইতেই-কুকি জাতিগত উত্তেজনাকে, যার ফলে শরণার্থী প্রবাহ ও মাদক পাচার বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষমতা বেড়েছে স্থানীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির। সীমান্ত এলাকাগুলির এ-হেন অস্থিতিশীলতা স্বাভাবিক ভাবেই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাকে। যে কোনও হিংসাই এই অঞ্চলে পুনরায় পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে, ফলে ভারতকে পা ফেলতে হচ্ছে সাবধানে। এ দিকে, দুই দেশের বেশ কয়েকটি সংযোগ প্রকল্প রয়েছে। যেমন, ভারত-মায়ানমার-তাইল্যান্ড ত্রিপাক্ষিক মহাসড়ক, যা মণিপুরের মোরে-কে মায়ানমারের মধ্য দিয়ে তাইল্যান্ডের মে সোতের সঙ্গে সংযুক্ত করে। শুধু তা-ই নয়, কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পেও বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে ভারত। শিলিগুড়ি করিডরের পাশাপাশি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার জন্য চিনের প্রভাব বলয়ের বাইরে ভারতের এক স্থিতিশীল, সার্বভৌম প্রতিবেশীর প্রয়োজন, যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করতে পারে। ভারতের নিজের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অস্থিরতার মাঝে, বাকি পড়শি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক এখন আরও বেশি জরুরি দিল্লির কাছে।

শতবর্ষ পরের সমাজবাস্তবতাতেও সমান প্রাসঙ্গিক *রক্তকরবী*

আত্ম-আবিষ্কারের নাট্য

অভীক মজুমদার

ইউ আর আন্ডার সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স'। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যান্ত্রিক চোখে লক্ষ করছে ব্যবস্থা: কখনও তার নাম রাষ্ট্র, কখনও কর্পোরেট, সঙ্ঘ বা দোকান-মালিক। মিশেল ফুকো *ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ* গ্রন্থে বেনথামের সূত্রে শুনিয়েছিলেন 'প্যান অপটিকন' নামক সর্বগ্রাসী এক কয়েদখানার প্রসঙ্গ। তার কেন্দ্রে এক জানলা বসানো মিনার থেকে চলে কয়েদিদের উপর অবিরাম নজরদারি। তার চাপে কয়েদিও ক্রমশ নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। যা কিছু স্বাভাবিক নিয়মনিষ্ঠ আইনস্বীকৃত— সেটাই করতে থাকে। তার মনের গভীরে কাজ করে ক্ষমতার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ।

মনে পড়ে *রক্তকরবী* নাটকের 'নাট্যপরিচয়' অংশ, "রাজমহলের বাহির দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তার ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের দেখাশোনা করে থাকেন।" নাটক শুরুর আগে: "এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য।" আবার, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'প্রস্তাবনা'র এক খসড়ায় আছে, "অদ্ভুত এই জানলা, জালের তৈরি। এর ভিতরকার রহস্য ও বাইরের লোক কিছুই জানে না।" ক্ষমতার সর্বময় নজরদারিতে দমবন্ধ যক্ষপুরীর কাহিনি শোনাচ্ছেন কবি। তার কেন্দ্রে রাজা ও তার অনুচর তথা মাতব্বরবৃন্দ; বড়, মেজো, ছোট সর্দার, মোড়ল। এই ব্যবস্থা একমুখী এক সর্বেক্ষণ প্রক্রিয়ায় মগ্ন, জালের জানলা যেন ক্ষমতার যন্ত্র-অক্ষি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের একশো বছর পরেও এ নাটক নতুন বিশ্ব, তার যুক্তি ও প্রযুক্তির দম্ভ, নিয়ন্ত্রণ— সব সাম্প্রতিকের সঙ্গেই কালে-কালান্তরে সংলাপ চালাচ্ছে। গ্রন্থাকারে এ নাটকের প্রকাশ বিশ্বভারতীর গ্রন্থালয় থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬।

রক্তকরবী নাটকটি 'সময়' নিয়ে নিজেও আলোড়িত। প্রথমে পৌষের গানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজার হুঙ্কার, 'আমার সময় নেই, একটুও না' আর 'সময় নেই'; মধ্য পর্বে বিশুর উপস্থিতিতে, 'এখনও সময় হয়নি'। শেষ পর্বে সময়ের প্রতিমা হয়ে দেখা দেয় নন্দিনী, তার হাতেই নির্ধারিত হয় সময়ের অভিমুখ: 'রাজা, এইবার সময় হল।... আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার লড়াই।' রাজার জাল ও জালের জানলা ছিঁড়ে-ভেঙে নতুন কালের ইশারা। সময় আর বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা তথা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও এ নাটকে তৈরি করা হয়েছে এক বিকল্প। বিপুল উৎপাদন ও সঞ্চয়ের কর্মযজ্ঞ, অন্তহীন বৈভব-লোভ-অত্যাচার-বঞ্চনার কাঠামো প্রকৃতপক্ষে ধরে থাকে কাল বা সময়ের রৈখিক চলন।

প্রথম আবির্ভাবেই কিশোর রক্তকরবী পৌঁছে দিয়ে যায় 'সময় চুরি' করে। বিশু সময়ের রৈখিক গড়ন আর উৎপাদন/সঞ্চয়ের চক্রকে পরিষ্কার করে, "পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিন দিন। সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি— এক হাতের পর দু'হাত, দু'হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি— এক তালের পর দু'তাল, দু'তালের পর তিন তাল... ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।" ধনতন্ত্র তথা শিল্পবিপ্লব-উত্তর পৃথিবীর এমনই দস্তুর। এই শ্বাসরুদ্ধ উৎপাদন চক্রের দিনানুদিনের বিরোধিতা করবে যে নাটক, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সেই ব্যবস্থার মৌল 'দর্শন' ভেঙেচুরে দিতে। তালগোল পাকিয়ে দিলেন কালানুক্রমেও। যে যুক্তি ও প্রযুক্তি দিয়ে যন্ত্রসভ্যতার উৎপাদন ব্যবস্থা এগোয়, তার বিপরীতে এল সময়ের ভিন্ন এক চেহারা। কাজের দিন আর ছুটির দিন মিলেমিশে এক ধরনের অনিবার্যতার কালক্রান্তিতে নিয়ে গেল নাটককে। নাটক জুড়ে, কালানুসারী ধনসম্পদ নির্মাণের বাস্তবতা চুরমার করার পটভূমি হিসাবে বহমান থাকে সময়ের এই 'সমন্বয়ী' প্রবাহ। হয়তো এ জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে, ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তের মোকাবিলায় এ নাটক একশো বছর ধরে আবির্ভূত হয়। নানা রাজনৈতিক সামাজিক বাস্তবতায় তার সংলাপ নতুন মাত্রায় চলতে থাকে সমকাল-ভাবী কালের সঙ্গে। অতীতের সঙ্গেও।

শম্ভু মিত্র যখন ১৯৫৪-য় এ নাটকের মঞ্চায়ন ঘটান, তখন হয়তো নজর ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, এক-ঢালা শাসক স্বর আর সাম্যবাদের স্বপ্নের দিকে। আবার উৎপল দত্তের জপেনদা এ নাটক পড়তে চান নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। বাদল সরকার পাঠ করতে চাইছেন সমকালীন আদর্শহীনতা ও অসাড় নগরজীবন মাথায় রেখে। আবার কৃষিজমি অধিগ্রহণের জোর-জবরদস্তির প্রেক্ষিতে ২০০৭-১০ কালপর্বে এবং পরেও এ নাটকের পাঠ-অভিনয় মঞ্চস্থ। শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এখনও ঘুরছেন গ্রাম মফস্‌সলের মাঠে-ঘাটে, দৃষ্টিহীন প্রান্তিক মানুষদের *রক্তকরবী* প্রযোজনা নিয়ে।

"এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে— কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে— সব বেশ মিলমিশ খেয়ে গেছে।" এ আমাদের চেনা সমসাময়িক পৃথিবী। সর্দার, মেজো সর্দার, ছোট সর্দার অনুবাদে হয়ে ওঠে 'গভর্নর' 'ডেপুটি গভর্নর' বা 'অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর'; পৌরাণিক, লোকায়ত অনুষঙ্গ ভেঙে বর্তমানের রাষ্ট্ররূপ 'ব্যবস্থা' আর 'যন্ত্র' শব্দগুলি জরুরি হয়ে দেখা দেয়। অ্যান্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার ভয়াবহ নিপীড়ন ও বস্তুগ্রাসকে তুলনীয় করে দেখেছিলেন এ দেশে দেশপ্রেমের নামে মানবশোষণের নিরিখে। দেশ-কাল ভেঙে সে জন্যই *রক্তকরবী* নাটক উড়ে বেড়াতে পারে সময় থেকে সময়ান্তরে, রাষ্ট্রীয় নজরদারির যুগে; সাঁজোয়া বাহিনীর হত্যালীলা, জাতিদাঙ্গা, দেশদখল বা দলতন্ত্র কায়েমের বাস্তবতায়।

প্রায় ১১টি খসড়ায় এ নাটককে গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুরু শিলং শহরে ১৯২৩-এর গ্রীষ্মে। খসড়ার পর খসড়া পেরিয়ে প্রথমে *প্রবাসী*-তে (১৯২৪) প্রকাশিত হয়। ওই বছরই ইংরেজি অনুবাদ *রেড ওলিয়েন্ডারস* বেরোয় *বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি* (সেপ্টেম্বর, ১৯২৪) পত্রিকায়। ইংরেজি অনুবাদটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ইংল্যান্ডে ১৯২৫-এ, বাংলায় নাট্যগ্রন্থ হিসাবে ১৯২৬-এ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এক বারই মঞ্চায়িত হয়েছে নাটক *রক্তকরবী*, ৬ এপ্রিল ১৯৩৪-এ। তবে পরে নানা সময়ে খ্যাতকীর্তি মানুষেরা এ নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তৃপ্তি মিত্র পরিচালনা করেছেন এই নাটক, মহলা দিয়েছেন রামকিঙ্কর, অভিনয় করেছেন কোনও মঞ্চায়নে দেবব্রত বিশ্বাস ও উমা চট্টোপাধ্যায়, আবার অন্য প্রযোজনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কম্বিনেশন নাইট-এ অভিনয় করেছেন সন্তোষ দত্ত। ২০০৬-এ এ পরিচালনা করেছেন 'তৃতীয় সূত্র'-এর পক্ষে সুমন মুখোপাধ্যায়।

নাটকের সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অনন্য মোচড়, অধস্তন ক্ষমতাধারীদের হাতে রাজার প্রতারণা। যুগে যুগে ক্ষমতার উচ্চতম শৃঙ্গটিকে নানা প্রবঞ্চনায় বিদীর্ণ করার চক্রান্ত চালায় ক্ষমতালোভী কিছু প্রধান পদাধিকারী। ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ এই শঠতার কাহিনিতে রবীন্দ্রনাথ পুরো নাটকটিকে বিপ্লবের চিরাচরিত ভাষ্য বা অবয়বের বাইরে নিয়ে যান। প্রথমে গজ্জু পালোয়ান সে দিকে ইঙ্গিত করেছিল, তার পর নাটকের অন্তিমে সর্দার, মেজো সর্দার এবং মোড়লের যোগসাজশে রাজাকে ঠকানোর ষড়যন্ত্র তৈরি হতে থাকে। সর্দার বলে, "রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়।" সেই প্রক্রিয়াতেই শেষে রাজার আর্তনাদ: "ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা।... আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।" এই জটিল ক্ষমতাতন্ত্র রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উদ্ভাবন।

রক্তকরবী-র পাণ্ডুলিপিগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে, আঁকিবুকি থেকে ক্রমে গড়ে উঠছে অত্যাশ্চর্য সব রূপাবয়ব: আদিম জীবজন্তু, নারীমুখের আদল, পাখি বা মানুষের আকার-প্রকার। *রক্তকরবী* পাণ্ডুলিপিচিত্রে অক্ষরের কাটিকুটি ভেদ করে মাথা আর দেহ তোলে এক দানবিক হিংস্র মূর্তি: লাল, বাদামি আর সাদার মিশ্রণে সে স্পষ্ট; এক মূর্তিমান হিংস্রতা। ক্ষমতার যে কদর্য চেহারা মানুষকে ব্যক্তিসত্তা থেকে অবনমিত করে সংখ্যা বা পদনামে, সেই রাক্ষসকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে দেন।

১৯২৪-এ জাপানে শিক্ষাবিষয়ক এক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমরা জেলখানার জন্য বন্দি জুটিয়ে আনি, পাগলাগারদের জন্য রোগী, আমরা শিশুদের মনগুলিকেও তেমনই ফাটকে সীমাবদ্ধ করে তুলছি, ভেঙেচুরে দিচ্ছি তাদের অন্তর্লীন ক্ষমতা...'। 'অন্তর্লীন' শব্দটি লক্ষণীয়, 'বন্দিশালা' 'অন্তর্লীন'ও হতে পারে। *রক্তকরবী* সেই আত্মবীক্ষণ, আত্ম-আবিষ্কারেরও নাটক।

■ কাল-জয়ী: শিল্পী গণেশ পাইনের চিত্রাঙ্কনে *রক্তকরবী*

বাঘে খেয়েছে, প্রমাণ কই

রঞ্জিত শূর

সুন্দরবনের দেউলবাড়ির বাসিন্দা আবুরালি মোল্লা মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের পেটে গিয়েছেন। আবুরালির সঙ্গীরা চোখের সামনে দেখেছেন, নৌকা থেকে বাঘ তাঁকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ কই? একটা কাগজ জোগাড় করার জন্য আবুরালির স্ত্রী মহিমা মোল্লা আজও নানা সরকারি দফতরে ধর্না দিচ্ছেন। কাগজ দিতে না পারায় তিনি জীবন বিমার টাকা, সরকারি ক্ষতিপূরণ পাননি, বিধবা ভাতার আবেদনও করতে পারছেন না। এ কেবল মহিমার দুর্ভাগ্য নয়, সুন্দরবনের অনেক ব্যাঘ্র-বিধবা তাঁদের আইনি প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন পঞ্চায়েত, বন দফতর আর পুলিশের সহযোগিতার অভাবে।

২০২৪-এর ৬ জুলাই, বন দফতরের কাছ থেকে বিএলসি (বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট) নিয়ে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন আবুরালি। ছিলেন আরও পাঁচ মৎস্যজীবী। ১১ জুলাই তাঁদের নৌকায় বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবুরালির ঘাড় কামড়ে তুলে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যায়। খোঁজাখুঁজি করেও সঙ্গীরা আবুরালির সন্ধান না পেয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। মহিমা ১২ জুলাই থানায় ডায়েরি করেন। গ্রামের লোকেদের পীড়াপীড়িতে ১৮ জুলাই বন দফতরের কর্মীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দেহ খুঁজতে যান। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা কিছুতেই নৌকা থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকতে রাজি হন না। যদি তাঁদেরও বাঘের মুখে পড়তে হয়? দেহ পাওয়া গেল না, রিপোর্টও লেখা হল না। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি (২০২১) অনুযায়ী, বাঘের আক্রমণে মারা গেলে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের এক জনের ফরেস্ট গার্ডের অস্থায়ী কাজ পাওয়ার কথা। আবুরালি বিএলসি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জীবন বিমা বাবদ দু'লক্ষ টাকাও পাওয়ার কথা মহিমার। কিছুই পাননি। তিন শিশু-সন্তান, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে আতান্তরে পড়েছেন।

বাঘের আক্রমণে মৃতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম অনেক দিনের। কিন্তু পঞ্চায়েত নেতা, স্থানীয় রাজনৈতিক দল এবং বন দফতর মিলে একটা অদ্ভুত চক্র ছিল সুন্দরবনে। মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কেউ বাঘের আক্রমণে মারা গেলে বা আহত হলেই বন দফতর বলত ওরা 'কোর' এলাকায় ঢুকেছিল, তাই সরকারের কিছু করার নেই। মৃতের সঙ্গী মৎস্যজীবী, নৌকার মালিককে পঞ্চায়েত ভয় দেখাত, তাঁদের সবার নামে মামলা হবে, পুলিশে ধরবে। ফলে তাঁরা চুপ করে যেতেন। বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর উল্লেখ না করে, পঞ্চায়েত অন্য কোনও কারণ দেখিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে বডি সৎকার করে দিত। এই খেলা চলছিল সেই বাম আমল থেকেই।

২০২৩ সালে মানবাধিকার কর্মীদের উদ্যোগে কলকাতা হাই কোর্টে বাঘের আক্রমণে মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবিতে একটি মামলা হয়। অত্যন্ত মানবিক একটি রায়ে 'কোর এরিয়া' আর 'বাফার এরিয়া'-র ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাকচ করেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, মৎস্যজীবী যে এলাকাতেই ঢুকুন, বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। 'কোর' এলাকায় ঢুকলেও দিতে হবে। এমনকি, বিএলসি না থাকলেও মৃত বা আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তাঁর এই রায়ে এবং মানবাধিকার কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় দুষ্টচক্রটি ভাঙে। এর পর বহু মামলা হয়। গত দু'বছরে হাই কোর্টে গোটা দশেক আবেদনের মীমাংসা হয়েছে, সব আবেদনকারী ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এর পরেও বন দফতর বা পঞ্চায়েতের তরফে মৃত বা আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানো, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ দেখা যায়নি। বছরে ২৫-৩০ জন মানুষ বাঘের আক্রমণে নিহত বা গুরুতর আহত হন, এঁদের ক'জনই বা আদালতে যেতে পারেন? সরকারি খাতায় সাত-আটটির বেশি ঘটনা দেখানো হয় না। তাতে বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ফলে কয়েক হাজার ব্যাঘ্র-বিধবা সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাননি। আহতদের ২ লক্ষ টাকা এবং নিখরচায় চিকিৎসা পাওয়ার কথা, তা-ও পাচ্ছেন না। এমনকি ময়না তদন্ত করতেও নিয়ে যেতে হয় পরিবারের খরচে।

এই প্রেক্ষাপটে আবুরালি মোল্লার মামলাটি দেখা দরকার। মহিমা মোল্লা হাই কোর্টে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করলে বিচারপতি স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, আবুরালি যে মৃত, তা কী করে মেনে নেবে আদালত? কোনও একটা সরকারি দফতরের সার্টিফিকেট তো লাগবে। অসহায় ভাবে মহিমার আইনজীবী বলেন, বন দফতর এবং পুলিশ যদি বাঘের ভয়ে জঙ্গলে না নামে, যদি দেহাবশেষ বা জামাকাপড় খুঁজে না আনে, আবার প্রত্যক্ষদর্শী সঙ্গীদের কথায় ভরসাও না করে, তা হলে মৎস্যজীবীর স্ত্রী কী করতে পারেন? কোথা থেকে ডেথ সার্টিফিকেট বা পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট তিনি জোগাড় করবেন? সহানুভূতিশীল বিচারপতি আইনজীবীকে আরও সময় দিয়েছেন, কোনও একটা সরকারি কাগজ মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে দাখিল করার জন্য। না হলে সব বুঝেও আদালত অসহায়।

অতএব কাগজের সন্ধানে ফের ঘুরছেন মহিমা মোল্লা— পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস, ডিএম অফিস, বন দফতর, সুন্দরবন টাইগার রিজ়ার্ভ-এর দফতরে। আর আশঙ্কা গাঢ় হচ্ছে, তবে কি বাঘের আক্রমণে মৃত-আহতদের প্রাপ্য না-দেওয়ার নতুন কৌশল মৃত্যুর প্রমাণপত্র না দেওয়া? মৃতের মর্যাদাটুকুও কি জুটবে না আবুরালিদের?

■ দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

নির্বাচনী লাভ

'যোগবিয়োগের খেলা' (৪-১২) শীর্ষক প্রবন্ধে প্রেমাংশু চৌধুরী ভোটার লিস্টে ভুয়ো ভোটারের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে যে যুক্তি তুলে ধরেছেন, তা অকাট্য। ভুয়ো ভোটার ঢোকানোর দরজা এ দেশে বরাবরই খোলা। এ বারের এসআইআর-এও তা খোলাই রাখা হয়েছে। অন্য রাজ্যের কেউ এসে যদি এই রাজ্যের রেসিডেন্শিয়াল সার্টিফিকেট জোগাড় করে তা দেখিয়ে এখানকার ভোটার হতে চান, তবে আইনত তাঁকে আটকানো যায় না। এঁরা হবেন ভুয়ো বৈধ ভোটার। সারা বছর চুপচাপ থেকে ভোটের ঠিক আগে এসআইআর দফতর খুলে বসলে এই সম্ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই বহুগুণ বেড়ে যায়। ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের স্বার্থেই এই সুযোগকে কাজে লাগায়। সে কারণেই বোধ করি ২০২৪-এ মহারাষ্ট্রে লোকসভা নির্বাচন থেকে বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে মাত্র ছ'মাসে ভোটার তালিকায় অন্তত ৩০ লক্ষ নতুন ভোটার যোগ হয়েছিলেন। রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাজার চিৎকার করলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে— ব্যাপারটা এমন নয়।

প্রবন্ধকার বিহারের ভোটার লিস্টের বহু নাম বাদ যাওয়া এবং যোগ হওয়া নিয়ে যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা থেকেও এসআইআর-এর প্রকৃত স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক কিছু বোঝার আছে। বিহারের ভোটার তালিকায় নাকি লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি, নেপালি, রোহিঙ্গা ছিলেন। বিহারে ৭.৮৯ কোটি ভোটারের মধ্যে প্রথমেই ৬৫ লক্ষের নাম বাদ পড়েছিল। তার মধ্যে ২২ লক্ষ মৃত, ৩৬ লক্ষ স্থানান্তরিত এবং ৭ লক্ষ 'ডুপ্লিকেট'। তা হলে অনুপ্রবেশকারীরা গেলেন কোথায়? অগস্টের খসড়া তালিকায় আরও ৩.৬৬ লক্ষ নাম বাদ পড়েছিল। তার মধ্যেও কত জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, তা জানা যায়নি। আর এক রিপোর্ট অনুযায়ী বিহারে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাটা ৩১৩। এর মধ্যে ৭৮ জন মুসলমান এবং বাকি ২৩৫ জন নেপালি হিন্দু। এর বাইরে কোনও অনুপ্রবেশকারী নেই। এ অনেকটা কালো টাকা উদ্ধারের মতো, যেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও কালো টাকার পরিমাণ কত তা জানা যাচ্ছে না, বা যা ঢাক পিটিয়ে বলা হচ্ছে তার ধারে কাছেও নয়।

তা হলে জনগণের দেওয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে, এত প্রাণের বিনিময়ে যে এসআইআর হচ্ছে বা হল, তার স্বচ্ছতা কোথায়? সবটাই কি ভোট-রাজনীতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত? ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষের প্রত্যেককে নথিপত্র দিয়ে প্রমাণ করতে হল তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন। অর্থাৎ, অনুপ্রবেশকারী খোঁজার যে দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দফতরের পালন করার কথা, তার দায় সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁদেরই প্রমাণ করতে বলা হল যে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক। এটা অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য থেকে, না কি মানুষকে আতঙ্কিত করে, তাঁদের চিন্তাভাবনা থেকে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্র, দুর্নীতি, মহিলাদের অমর্যাদা-নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষা-চিকিৎসার সমস্যার মতো বিষয়কে দূরে সরিয়ে রেখে ভোট-রাজনীতিতে সুফল তোলার কৌশল?

গৌরীশঙ্কর দাস
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বশাসিত

প্রেমাংশু চৌধুরীর 'যোগবিয়োগের খেলা' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলি, নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষন সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র চালু করেন। তার পর গঙ্গা পদ্মার অনেক জল বয়ে গিয়েছে আজ অবধি। ২০০২-০৩ সালে শেষ বার এসআইআর হওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি ভুয়ো ভোটার আটকানো গেল না। এত মন্ত্রী সান্ত্রি পাইক বরকন্দাজ ভোটের আঙিনায় নামিয়েও মৃত ভোটারের নামে ভোট, স্থানান্তরিত ভোটারের ভোট, অনুপ্রবেশকারীদের ভোট বন্ধ করা যায়নি। এমনকি জীবিত ভোটারদের ভোটও কখনও-কখনও অন্য মানুষ দিয়ে চলে যায়। এই সব কিছুই বন্ধ করা যায় যদি নির্বাচন কমিশন সব রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে উঠে নির্বাচনকে নিরপেক্ষ ভাবে চালনা করে। এ ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, মাইক্রো-পর্যবেক্ষকদের সকলকে পুরোদস্তুর নিরাপত্তা প্রদান। ভোটকর্মীরা সেক্টর অফিসে রিপোর্ট করে ভোটের সরঞ্জাম নেওয়ার পর তাঁদের সশস্ত্র পুলিশি পাহারাতে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া থেকে ভোট শেষ হওয়ার পর ভোটবাক্স নিয়ে সেক্টর অফিস গিয়ে জমা দেওয়ার পরে পুলিশপাহারা সহকারে তাঁদের গন্তব্যস্থল অবধি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটের দিন যে কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথ পাহারায় হাতে আধুনিক বন্দুক নিয়ে থাকে, তারা সাধারণত কোনও বড় গোলমাল হলে ঠেকানোর জন্য থাকে। ভোটকর্মীদের সুরক্ষা তারা দেয় না। এ ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশকে এই ভোটকর্মীদের পাহারার দায়িত্ব দিতে হবে। মহিলা পুলিশকর্মীদের রাখতে হবে। কারণ, বহু বুথে অনেক মহিলাকর্মী ভোট পরিচালনা করতে যান। ভোটকেন্দ্রে সকাল ছ'টায় মক পোল হয়ে গেলে অনেক সময়ই শাসক দল ছাড়া অন্য দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বুথ ছেড়ে চলে যান। বিশেষত মফস্‌সল ভোট কেন্দ্রে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই ক্ষেত্রে সকল দলের প্রার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোট যত ক্ষণ না শেষ হচ্ছে তত ক্ষণ অবধি ভোট কেন্দ্রে থাকতে হবে। এঁরা এলাকার সকল ভোটারকে চেনেন। তাই নকল বা ভুয়ো ভোটার চিনিয়ে দিতে এঁরা সাহায্য করতে পারেন।

দেবানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৩২

অস্বচ্ছতা

'বিমা করলেও সুরক্ষা কোথায়' (৮-১২) শীর্ষক নীলাঞ্জন দে-র প্রবন্ধটি পড়লাম। অসুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিমায় রকমারি নিয়মগুলি মানুষ ঠকানো। সাধারণ মানুষ অসুস্থ হলে তবেই চিকিৎসকের কাছে যান, হাসপাতালে চিকিৎসকদের পরামর্শে ভর্তি হন এবং প্রয়োজনে অপারেশন করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। নির্ধারিত কিছু সংখ্যক সচেতন মানুষ এই স্বাস্থ্যবিমার আওতায় থাকেন, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত টাকা সেই সংস্থাকে দিয়ে থাকেন। তার পর ক্লেম হলে নির্ধারিত প্রমাণপত্র প্রদান করে ডাক্তারবাবু, হাসপাতালের বিল, ওষুধের বিল প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সেটলমেন্ট হয়। পলিসি অনুযায়ী প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। সেটাই সাধারণ মানুষজন জানেন বা বোঝেন।

কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, স্বাস্থ্যবিমা কর্তৃপক্ষ বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, নির্দিষ্ট কিছু অসুখ তাঁদের বিমা চুক্তির মধ্যে পড়ে না। সাধারণ বিমাকারীদের পক্ষে আগাম এ বিষয়টি জানা সম্ভব নয়। এজেন্টও এই বিষয়ে সব সময় আলোকপাত করেন না। স্বাস্থ্যবিমা সব রোগের জন্যই হওয়া উচিত। মানুষকে এমন বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি দিতে সরকার হস্তক্ষেপ করুক।

দেবাশীষ দত্ত
কলকাতা-৬৩

নতুন বছর

আবার একটা বছর শেষ হল। একটা তো বছরই। যেমন প্রতি বছর হয়, তেমনই। কিন্তু প্রতি বছর একটা কী পেলাম আর কী হারালাম গোছের আলোচনা সব জায়গায় শুরু হয়ে যায়। যেমন বলা হচ্ছে, ২০২৫ সাল কারও ভাল কাটেনি। চার পাশে নাকি কেবলই খারাপ খবর। আসলে সময় কখনও নিখুঁত হয় না। তা সত্ত্বেও আমাদের মন মানে না। আসলে কী তাই? এত খারাপ ঘটনার মাঝেও নিজেকে কি নতুন ভাবে চিনিনি? একটু হলেও কি বদলাইনি নিজেকে? বদলে যাওয়াই তো অলিখিত নিয়ম। কিন্তু যা বদলাচ্ছে না, তার কথা উঠছে কই। বেঁচে থাকার জন্য আজকাল একটু বেশিই কড়ি খরচ হচ্ছে না কি? নব্বই পেরিয়ে যাওয়া টাকার মূল্য অবশ্য আমজনতা বুঝবে না, কিন্তু আলু পটল মুলো উচ্ছে কিনতে গেলে তাঁদেরও পকেটে ছ্যাঁকা লাগে। ২০২৫-এও লাগত, ২০২৬-এও লাগবে। জীবন মানে শুধু পার্ক স্ট্রিটের শ্যাম্পেন নয়, ঝিটাবেড়ার দেওয়ালে আগড় দেওয়া দরজার ফাঁকে ফুরফুরে হাওয়ায় রেশনের চাল সেদ্ধ চেবোনোর গল্পও হোক। নতুন বছর তো তাঁদেরও।

শঙ্খ অধিকারী
সাবড়াকোন, বাঁকুড়া

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।